পৃথিবীর ইতিহাস

(১১/১২/২০২০এবং২০২১-২০২৩)

দ্বিতীয় খণ্ড

কুন্তল চক্রবর্তী

কিছু বিশেষ কারণবসত আর্টিস্টিক ব্যালেটের তত্ত্বাবধানে কুন্তল চক্রবর্তীর লেখা

- পৃথিবীর বিস্ময়[01.01.2024-31.01.2024]
- প্রেমপত্র[31.03.2024-24.05.2024]
- অলিক দ্বন্দ্ব[31.05.2024-31.12.2024]
- অবাস্তব ইচ্ছে[10.02.2024-21.02.2024]
- কল্পবিজ্ঞান[30.05.2024-31.05.2024]
- কল্পনার জগৎ[30.05.2024-31.05.2024]
- শেষ গন্তব্য[31.12.2025-01.01.2026]

বই গুলিকে তার-ই লেখা পৃথিবীরইতিহাস (11.12.2020and2021-2023) নামক বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, এবং এটি আর্টিস্টিক ব্যালটের চরম সিদ্ধান্ত।

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
• পৃথিবীর বিস্ময়	04
• প্রেম পত্র	09
• অলিক দ্বন্দ্ব	15
• অবাস্তব ইচ্ছে	06
• কল্পবিজ্ঞান	11
• কল্পনার জগৎ	17
• শেষ গন্তব্য	20

পৃথিবীর বিস্ময়

০১/০১/২০২৪

[সুপ্রভাত আমি পৃথিবী, সৌরজগতে আমি অংশ নিয়েছি প্রায় ৫০০ বছরেরও আগে অর্থাৎ আমার বয়স ৫০০ বছরেরও বেশি। যখন আমি ওই অগ্নিপিন্ডতা থেকে জন্ম নিলাম তখন আমার সারা গায়ে আগুন জ্বলছে। জন্মের পর কয়েক বছর হিসাব রেখেছিলাম নিজের বয়সের তারপর আর রাখা হয়নি।]

[তারপর অনেক বছর কেটে গেছে কখনও আমার গায়ে জ্বলছে আগুন আবার কখনও বা সারাগা ঢেকে গেছে সাদা জটিল বরফের চাদরে। এইভাবে কাটলো কয়েকশো বছর। তারপর একটাসময় এলো যখন আমার বুকে শুরু হলো প্রাণের উৎপত্তি। প্রথমে এক কোশি, পরে দ্বিকোশি, এইভাবে সৃষ্টি হলো অসংখ্য কোশ যুক্ত মানুষ। এই মানুষেরা যখন নিজেদের আমার এই বহুতলবিশিষ্ঠ বুকে সামলে নিয়েছে তখন শুরু হলো তাদের উন্নতির যাত্রা]

আস্তে আস্তে তাঁরা নতুন বসতি স্থাপন করলো, বিভিন্ন কাজে, যেমন- কৃষিকাজ, জলসেচ, মৃৎশিল্প, শিকার, পূজার্চনা প্রভৃতিতে উন্নত হলো। আমিও ভাবলাম আমার দুঃখের দিন শেষ আর সুখের দিন শুরু। কিন্তু কে জানত যে আমার ভাবনা ভুল। এই মানুষেরা ভীষণ লোভী, এরা যত পায় ততো চায়, আর এদের চাহিদা মেটাতে বিপদে পরছি আমি। আমার মধ্যে থাকা বিভিন্ন সম্পদকে মানুষ বিভিন্ন ভাবে উত্তোলন করছে কিন্তু তারা তার ব্যবহার উচিৎ কাজে করছে না। আবার যতটাই বা উচিৎ কাজে ব্যবহার করছে তার থেকে বেশি করে অপচয়। কিন্তু এই হতচ্ছারারা এটাই বোঝেনা যে জিনিস গুলো শেষ হয়ে গেলে পরে তাদেরই অসুবিধা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলছি যেমন-জল, আমার বুকে বিশালাকৃতির ছিদ্র করে জল তোলে কিন্তু সেই জল সম্পূর্ণ কাজে লাগেই না, অর্থাৎ কাজের জলটুকু বাদে পুরোটাই অপচয়, আর দূষণের কথাতো ছেড়েই দিলাম, আস্তে আস্তে আমার যা অবস্থা করছে তা দেখে মনে হচ্ছে আর কয়েকদিন পর আর মাঠ-ঘাট কিচ্ছু থাকব না। শুধুই থাকবে উঁচু উঁচু ইমারত, বড় বড় অট্টালিকা আর ফ্ল্যাট। আর নদ-নদীর অবস্থা দেখে এবং সেই জলের ব্যবহার দেখে নিজেরই অবাক লাগে। যেই জলে গৃহস্থালির আবর্জনা, মল-মূত্র মিশছে আবার সেই জলই কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন ধার্মিক শুভ কাজে। আর কত বলব এদের অত্যাচার। এরা যেন আমার গায়ের উপর আস্তে আস্তে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা দিনকেদিন যত উন্নত হচ্ছে তত পরিবেশ দূষণ বাড়াচ্ছে।আজ আমি যত চিন্তাকরি ততই বিস্মিত হই।

[আজ যদি আমাদের পৃথিবী কথা বলতে পারত, তবে এটাই হতো তাই বক্তব্য]

অবাস্তব ইচ্ছে

১০/০২/২০২৪

অবিনাশ বাবুর বাড়ির প্রতিটি ধুলিকণায় যেন সুমিত্রার অস্তিত্ব মিশে আছে। দশ বছর আগে এক বৃষ্টির বিকেলে সুমিত্রা যখন চলে গেল, অবিনাশ বাবু তখন থেকেই পৃথিবীর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত মেধা এখন ব্যয় হচ্ছে এক অসম্ভব নেশায়–সময়কে উল্টো দিকে ঘোরানোর যন্ত্র তৈরিতে।

তাঁর পড়ার ঘরটি এখন আর পড়ার ঘর নেই, সেটি যেন এক অদ্ভুত ল্যাবরেটরি। চারদিকে তারের জঞ্জাল, অসিলেস্কোপের নীল আলো আর পুরনো ডায়েরির পাতা। অবিনাশ বাবুর চুল পেকে সাদা হয়েছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তাঁর জেদ অটুট। তিনি চান, সেই বিকেলটাকে আবার ফিরে পেতে–যে বিকেলে সুমিত্রা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল আর বলেছিল, "অবিনাশ, তুমি কি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে?" অবিনাশ সেদিন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "মৃত্যু ছাড়া আমাদের আলাদা করার সাধ্য কার?" সেই কথাটাই আজ তাঁর কাল হয়েছে।

দশ বছর পর, এক ঝোড়ো রাতে যন্ত্রটি শেষ পর্যন্ত সচল হলো। ঘরের বাতাস কাঁপতে শুরু করল, যেন মহাকাশের কোনো এক অদৃশ্য দরজা খুলে গেছে। অবিনাশ বাবু যন্ত্রের লিভার টেনে ধরলেন। হঠাৎ চারপাশের দেয়ালগুলো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, তিনি সেই পুরনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। সুমিত্রা ঠিক আগের মতোই নীল শাড়ি পরে চেয়ারে বসে আছে, হাতে চায়ের কাপ। তার চুলে বৃষ্টির ছাঁট লেগেছে।

অবিনাশ বাবুর বুকটা ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। তিনি দৌড়ে গিয়ে সুমিত্রার হাত ধরতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর হাত সুমিত্রার কাঁধের ভেতর দিয়ে চলে গেল। সুমিত্রা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না। সে কেবল সেই পুরনো মুহূর্তের একটি প্রতিচ্ছবি। অবিনাশ বাবু চিৎকার করে বললেন, "সুমিত্রা! আমি এখানে! আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি!"

কিন্তু সুমিত্রা কেবল জানালার বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। সে ঠিক সেই কথাগুলোই আবার বলতে শুরু করল, যা সে দশ বছর আগে বলেছিল। অবিনাশ বাবু বুঝতে পারলেন, তিনি সময়কে ফিরিয়ে আনেননি,

তিনি কেবল একটি পুরনো স্মৃতিকে প্রজেক্টরের মতো চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। তিনি সুমিত্রার খুব কাছে গিয়ে তার গায়ের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেখানে কেবল শূন্যতা আর ঠান্ডা বাতাস।

হঠাৎ যন্ত্রটি বিকট শব্দে কেঁপে উঠল। সময়ের ফাটল বন্ধ হতে শুরু করেছে। সুমিত্রার অবয়ব ঝাপসা হয়ে আসছে। অবিনাশ বাবু পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, "না! যেও না! এবার আমি তোমাকে যেতে দেব না!" তিনি সুমিত্রার হাতটা আঁকড়ে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁর আঙুলগুলো কেবল বাতাসের অণু স্পর্শ করল। সুমিত্রা মিলিয়ে যাওয়ার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিন্তু তার চোখে অবিনাশের জন্য কোনো স্বীকৃতি ছিল না। সে কেবল সেই পুরনো স্মৃতির অংশ হয়েই মিলিয়ে গেল।

যন্ত্রটি নিভে গেল। ঘর আবার অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু অবিনাশ বাবুর চোখের জল থামছে না। তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এই অবাস্তব ইচ্ছা তাঁকে এক ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে–মানুষ মরে গেলে কেবল পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় না, সে মানুষের স্মৃতি থেকেও ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়। তিনি যা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, তা আসলে কোনো মানুষ নয়, তা ছিল কেবল একটি মরীচিকা।

ভোরবেলা প্রতিবেশীরা যখন ঘরে ঢুকল, দেখল অবিনাশ বাবু চেয়ারে বসে আছেন, চোখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। তাঁর হাতে ধরা সুমিত্রার সেই পুরনো ছবিটা। তিনি আর নেই। হয়তো তিনি সেই যন্ত্রের অলিগলি পেরিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখানে সময় আর কোনো বাধা নয়, যেখানে সুমিত্রা সত্যিই তাঁর অপেক্ষায় আছে। কিন্তু টেবিলের ওপর পড়ে থাকা যন্ত্রটি তখনো মৃদু কাঁপছিল, যেন কোনো এক অসম্পূর্ণ ইচ্ছার দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়াচ্ছিল।

প্রেম পত্র

৩১/০৪/২০২৪

শহরের পুরনো উত্তর কলকাতার এক জরাজীর্ণ অট্টালিকার ধুলোমাখা ঘরে বসে ছিলেন গোয়েন্দা অনির্বাণ। তার টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আছে এক মৃত কবির ফেলে যাওয়া নথিপত্র। কবির মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক হলেও, তার পরিবারের দাবি ছিল—কবির গোপন কোনো সম্পদ কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। তদন্ত করতে করতে অনির্বাণের নজর পড়ল কবির ব্যবহৃত সেই প্রাচীন মেহগনি কাঠের ডেস্কটির দিকে। ডেস্কের একটি গোপন খোপ থেকে বেরিয়ে এল একটি হলদেটে খাম। খামের ওপর কোনো নাম নেই, শুধু লেখা যে কখনো অপেক্ষা করেনি, তার জন্য।

অনির্বাণ খামটি খুললেন। ভেতরে একটি চিঠি। কালির রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে যেন এক গভীর হাহাকার মিশে আছে। চিঠির লেখিকা লাবণ্য। তিনি লিখছেন, কীভাবে সামাজিক মর্যাদা আর পারিবারিক সম্মানের দোহাই দিয়ে তাকে এক অপরিচিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর তার প্রেমিক, যে ছিল এক স্বপ্নদ্রষ্টা বিপ্লবী, তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হয়েছিল দেশদ্রোহিতার অপরাধে।

চিঠিতে লেখা ছিল, আমাদের প্রেম কোনোদিন পূর্ণতা পাওয়ার ছিল না, অনির্বাণ। কারণ, আমরা জন্মেছিলাম এমন এক সময়ে, যেখানে ভালোবাসার চেয়েও বড় ছিল আদর্শ আর বংশমর্যাদা। আমি আজও সেই বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকি, যেদিন তুমি ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিলে।

অনির্বাণ ফাইলগুলো বন্ধ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যে সম্পদের খোঁজে তাকে ডাকা হয়েছিল, তা আসলে কোনো সোনাদানা নয়। এই চিঠিই ছিল কবির জীবনের একমাত্র সম্পদ—এক অসমাপ্ত প্রেমের দলিল। বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামছে। অনির্বাণ চিঠিটি আবার খামে ভরে আগের জায়গায় রেখে দিলেন। তিনি জানতেন, কিছু রহস্যের সমাধান করতে নেই; কিছু রহস্যকে তার ট্র্যাজেডির আড়ালেই চিরকাল ঘুমিয়ে থাকতে দিতে হয়।

গোয়েন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার মনে হলো, আজ তিনি কোনো অপরাধীকে ধরেননি, বরং এক মৃত মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে স্পর্শ করে এসেছেন। বৃষ্টির শব্দে তখন যেন লাবণ্যের সেই না পাঠানো প্রেমপত্রটিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

কল্পবিজ্ঞান

৩০/০৫/২০২৪

আর.জে.রয় মৃত্যু রহস্য

আজ প্রায় সাত বছর হতে চললো আর.জে.রয় স্যার আমাদের মধ্যে নেই। মাঝে মধ্যে ওনার কথা খুব মনে পরে, আর তারই সঙ্গে মনে পরে সেই রহস্য জনক ঘটনা।

সময়টা ছিল পৌষমাস, বুলেট রিসার্চ রুমের পাশে এক্সামিন হলে আমরা তিনজন ছাত্র, আমি, মিস্টার টি.রয় এবং মিস্টার সেন ছিলাম। সেখানে অনেক রকম অত্যাধুনিক হাতিয়ার সহ বিভিন্ন গুলির বিন্যাস ছিল।

সেগুলি পর্যবেক্ষণ কালে আমাদের মনে একটি অদ্ভুত চ্যাপ্টা গোছের গুলির প্রতি প্রশ্ন উদিত হলো, যে কেন সেটি মাঝে মধ্যে প্রটেকটিং ফ্লুইডের উপর ভেসে উঠছে, কখনও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও ডুবে যাচ্ছে, এই অদ্ভুত আবিষ্কারের নাম কি? সেই সময় প্রফেসর আর.জে.রয় পাশের বুলেট টেস্টিং ল্যাবে রিসার্চ করছিলেন, তাই আমরা তাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখি উনি ব্যস্ত, তাও কৌতূহল মেটাতে তাঁর মগ্নতা ছিন্ন করে তাকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সব শুনে তিনি বলেন স্পাই বুলেট। আমার আমাদের কৌতূহল মিটিয়ে আবার এক্সামীন হলে ঢুকতে যাব, এমন সময় এক হাড়কম্পন তীব্র আওয়াজে কানে তালি লেগে যাওয়ার জো। আমরা ব্যাপারটা প্রায় আন্দাজ করে দ্রুত গিয়ে ল্যাবের ইমারজেন্সি ওপেন অন করে ভিতরে ঢুকলাম, ততক্ষণে NAA-এর সদস্যরাও এসে হাজির, তারা তদন্ত নিজেদের হাতে তুলে নিলে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। পরদিন তদন্তের সার্থে আমাদের ডাকা হলে, আমরা যা, যতটুকু জানতাম সব বললাম, তারপর তাদের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। এর পর কেটে গেছে প্রায় আঠেরোটা মাস। একদিন কি এক বিষয়ে স্মৃতিচারণ কালে সেই বীভৎস ঘটনা মনে পড়ল, আর মনে পড়ার সাথে সাথে ছুটলাম রেকর্ড স্টোর রুমে, সেখানে গিয়ে প্রায় আট ঘণ্টার প্রবল চেষ্টার পর ফাইলটা খুঁজে পেলাম।

সেখানে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাঁর সাথে ঠিক কী ঘটেছিল, টা জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হয়, কোনো নতুন গুলি আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

কল্প বিজ্ঞান

আজকাল মনের অবস্থা ঠিক ভালো নয়। কবে থেকে পরিকল্পনা করছি এমন এক প্রযুক্তির, যার দ্বারা মানুষ রকেট ছাড়াই চাঁদে পৌঁছতে পারবে। তার জন্য শুধু মাত্র দরকার হবে যন্ত্রটি, এবং এই যন্ত্র তৈরি করাতেই যত বিপত্তি। আসলে বিপত্তির কারণ হলো আমার রোবট মার্সম্যান, আমি যাই করতে যাইনা কেনো। তার সব কিছুতেই আপত্তি। অবশেষে কাল প্রায় ৩০ ঘণ্টার পরিশ্রমের পর আজ যন্ত্রটা প্রস্তুত হলো। তবে তা দিয়ে চাঁদে সরাসরি যাওয়া যাবে কিনা তা জানিনা। এখনো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আপাতোত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যাচ্ছে। এবিষয়ে প্রথমে ভেবে ছিলাম কাউকে কিছু বলবো না, তবে তার জো নেই। আজ সকালে আমার পরিচারক একটা চিঠি দিয়ে গেল। হাতে লেখা নয়, ডিজিটাল কার্ড, অর্থাৎ শুধু খাম থেকে বাইরে বের করতে হবে। তাতে বলা আছে, আগামী ৬ই আগস্ট একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, দা ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে(এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, দা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস হলো এক শূন্যে ভাসমান মঞ্চ, যা এক বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে।)সেখানে নিজের কোনো আবিষ্কার প্রদর্শন করা যাবে। আমি এই লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না, তাই যাব বলেই ঠিক করলাম। যথা দিন, যথা সময়ে রওনা দিলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। গন্তব্যে পৌঁছে খুব সুন্দরভাবে সব প্রায় মিটে গেলো, প্রদর্শনীর সমাপ্তি কালে এক ভদ্রলোক মেশিনটি কিনতে চাইলে, আমি তার প্রস্তাবে সম্মতি না দাওয়াতে তিনি আমার সাথে অসভ্য ব্যবহার করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত সদস্যদের এভাবে হেনস্থা হতে দেখে এম.এস-এর সদস্যরা তাকে সেখান থেকে বার করে দিলেন। এই ঘটনার পরই শুরু হয় থেকে থেকেই হুমকি দেওয়া মেসেজ আসতে, এই ভাবে চলতে চলতে দু-একবার আমার উপর হামলাও হয়, এর পর আইনি ব্যবস্থা ও সুরক্ষা নেওয়ায় আর হয়নি, পরবর্তীকালে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর নিয়ে জেনে ছিলাম ওই ব্যক্তির নাম জে.ধনকর, এ শহরের নামকরা ধনী ব্যক্তি, তার এই টাকার উপর এত অহংকার, যে তিনি কারোরই কাছ থেকেই প্রত্যাখান সহ্য করতে পারেনা। সে যাই হোক, অবশেষে সাফল্য অর্জন করা গেলো, রিসার্চটা পেটেন্ট করে নিয়েছি গতকাল।

আজ আমার একটা সেমিনার আছে বলে, আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম, বাড়িয়ে ছিল আমার পরিচারক আর মার্সম্যান। সেমিনার যখন প্রায় শেষ তখন একজন হন্ত-দন্ত হয়ে খবর দিয়ে গেল, আমার বাড়িতে রহস্য জনক-ভাবে বিধ্বংসী আগুন লেগে সমস্ত জিনিস পুড়ে গেছে, এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

একথা শোনার সাথে সাথেই এক ব্যক্তি নিজেকে গোয়েন্দা দপ্তরের লোক বলে পরিচয় দিয়ে আমাকে মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্য নিয়ে গেলেন। প্লাস্টিকে মোরা তিনটি অর্ধদগ্ধ প্রাণী দেহ,

প্রথমটি দেখেই বলে দেওয়া যায় ওটা মার্সম্যান, দ্বিতীয়টি সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হলেও আমার পরিচারক-কে অনেক কষ্টে সনাক্ত করতে পারলাম, তৃতীয়টির কাছে গিয়ে যখন সনাক্ত করার চেষ্টা করছি, এমন সময় আচম্বিতে চমকে উঠলাম ওই রিস্ট ওয়াচটা দেখে, এবং বুঝতে পারলাম এ সেই ভদ্রলোক যার সাথে আমার প্রদর্শনীতে শেষবারের মতো অত্যন্ত বাজে-ভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এই দৃশ্য এবং ধ্বংসস্তূপ দেখার পর আমার কাছে সমস্তটা পরিষ্কার হলো, ওই ভদ্রলোক আমার প্রত্যাখ্যানকে সম্মতিতে রূপান্তরার্থে এসেছিলেন আমার বাড়িতে, সেখানে কোন কারণে উত্তেজনায় বশবর্তী হয়ে তিনি তার বন্দুকটি বের করে বসলে ল্যাবের সিকিউরিটি সিস্টেম অন হয়ে যায়, এবং সিকিউরিটি গ্যাস স্বশব্দে ফেটে যায়, আর তার ফলেই ওই আগুন, আর আগুনে গেলো তিনটি প্রাণ এবং আমার আবিষ্কার।

Artistic Ballets

অলিক দ্বন্দ্ব

৩১/০৫/২০২৪

অনির্বাণ নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে। ফ্ল্যাটটি বেশ পুরনো, কিন্তু ভাড়ার তুলনায় অনেক সস্তা। প্রথম রাতে সে লক্ষ্য করে, তার শোবার ঘরের বড় আয়নাটিতে সে যখনই তাকায়, মনে হয় তার প্রতিচ্ছবিটি তার চেয়ে এক সেকেন্ড দেরিতে নড়ছে। সে হাত তুললে আয়নার প্রতিচ্ছবিটি যেন খুব সূক্ষ্ম এক মুহূর্তের ব্যবধানে হাত তোলে। সে এটাকে চোখের ভুল ভেবে এড়িয়ে যায়।

তৃতীয় রাতে অনির্বাণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় ঘরের কোণ থেকে আসা একটা খসখসে শব্দে। সে চোখ খুলে দেখে, ঘরের বাতিটা জ্বলছে না, কিন্তু আয়নার ভেতর থেকে একটা মৃদু নীলচে আলো বেরিয়ে আসছে। সে দেখল, আয়নার ভেতরে সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার পরনে সেই কাপড় নেই যা সে পরে ঘুমিয়েছিল। আয়নার ভেতরের 'অনির্বাণ' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় এবং তাতে কোনো মণি নেই।

অনির্বাণ ভয়ে জমে গেল। সে দেখল, আয়নার ভেতরের সেই সত্তাটি ধীরে ধীরে আয়নার কাঁচের ওপর হাত রাখল। কাঁচটি যেন তরল হয়ে গেল, আর সেই সত্তাটি অনির্বাণের ঘরের মেঝেতে পা রাখল। অনির্বাণ চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। সে দেখল, সেই সত্তাটি তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল এবং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি তোকে অনেকদিন ধরে দেখছি, কিন্তু আজ থেকে তুই আয়নার ভেতরে থাকবি।"

পরদিন সকালে অনির্বাণের বন্ধু তাকে খুঁজতে এসে দেখল, ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সে দেখল, অনির্বাণ নেই। কিন্তু ঘরের বড় আয়নাটির সামনে অনির্বাণকে দেখা যাচ্ছে। সে আয়নার ভেতরে আটকা পড়ে আছে, তার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর ঘরের ভেতর যে অনির্বাণটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা কুটিল হাসি হাসল।

আজও সেই ফ্ল্যাটটি খালি পড়ে আছে। মাঝেমধ্যে প্রতিবেশীরা শুনতে পায়, বন্ধ ঘর থেকে কেউ একজন আয়নায় ধাক্কা দিচ্ছে আর ফিসফিস করে বলছে, "আমি আসল, আমি আসল।" কিন্তু আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সেখানে কেবল নিজের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায়, যা হয়তো এক সেকেন্ড দেরিতে নড়ছে।

কল্পনার জগৎ

৩০/০৫/২০২৪

এটি এস.বি.আই.এইচ.এ-এর ইতিহাস থেকে গৃহীত

আজ সকাল বেলা ঘুমটা সোলার ক্লকের আওয়াজে ঠিক সময়ে ভাঙলো। চোখ খুলে দেখি সেফ এসে কফি দিয়ে গেছে। উঠে ফ্রেশ হয়ে গেলাম আমার লাবে। ল্যাবে আজকাল একটা নতুন ব্যাপারে রিসার্চ চলছে। আজ আমার জন্মদিন, তাই ল্যাবের গেটটা উপরে উঠে যাবার সাথে সাথে এ.আই আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালো।

এরপর কখন যে রিসার্চের কাজ করতে করতে সময়টা কেটে গেল, বোঝবার উপায় নেই। রিসার্চের বিষয় হলো অষ্টমানব, অর্থাৎ কোনো একটা প্রাণীর দেহে যদি আটটা মানুষের সমান শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হয়, তবে কী হবে সেটাই দেখার বিষয়। যথা সময়ে ল্যাবের কাজ শেষ করে, ঘরে গিয়ে দা.প্রেশাসক্রাউন বইটা পরছি এমন সময়, ওয়্যারলেসটা বেজে উঠল - “আলফা ওয়ান সিক্স হিয়ারিং” , আমি তড়িঘড়ি জ্যামার অন করে বললাম - বলছি! বলুন। ওপাশ থেকে খবর এলো আমার ল্যাব থেকে নাকি কিসের একটা বিকট শব্দ বেড় হচ্ছে। আমি শুনে ছুটলাম ল্যাবের উদ্দেশ্যে, আমার ল্যাব আমার ঘরের থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত, তাই পৌঁছতে দেরি হলো না। গিয়ে দেখি পাশের ল্যাবের প্রফেসর আমার দিকে চেয়ে আতঙ্কিত ভাবে আমার ল্যাবের সামনে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখা মাত্র তিনি আতঙ্কিত ভাবে বললেন মি.এক্স তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখুন ভেতরে কী হয়েছে। হাইপার আইডি দিতেই দরজা উপরে উঠে গেলো, দরজাখোলা ল্যাবের ভিতরের অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, একটা প্রসেসিং মেশিনের জারের ভিতর একটি মতকে ধরে রেখে তার ওপর ওই অষ্টমানব রিসার্চ চালাচ্ছিলাম, সেই পতঙ্গটির ওড়ার বেগ অতিরিক্ত, এর থেকেই আমি নিশ্চিত হলাম, আমার সাধনা সফল। পরদিন আমার এই সাফল্যের সব রিসার্চ পেপার পার্লামেন্টে জমা দিয়ে এলাম। তাতে অবশ্য কিছু লোকের বিশেষ শান্তি হলোনা, কারণ তারা আমাকে হিংসা করে। তারপর গেলাম কোর্টে কারণ আজ আমার বিচারপতি হবার শেষ এবং প্রধানতম পরীক্ষা। যথা সময়ে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছি, এমন সময় পেছন থেকে কেউ হঠাৎ আক্রমণ করায় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরলো, আমি ইলেকট্রিক সেলের ভিতর। অনেক চিৎকার করাতে একজন পুলিশ কর্মী জানালেন আমি নাকি আলখোলিক ড্রাগস নিয়ে অন্যদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করেছি। পরের দিন যথারীতি ব্যাপারটা কোর্টে উঠল, বিচারপতি কে.এস.সেন আমার বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। অবশেষে লবির হিডেন ক্যামেরার দৌলতে আমি বেকসুর খালাস হলাম এবং করা এই মিথ্যে বদনাম আমাকে দিয়েছিল, তাদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হলো। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বের হলো তখন দেখলাম আমি সেকেন্ড হয়েছে, অর্থাৎ এখন আমার বেতন বেড়ে আটলক্ষ টাকা হলো। পরেরদিন আমি প্রথম কোর্টে প্রধান বিচারপতির আসনে বসলাম, আর পরদিনই ঘটলো বিচ্ছিরি একটা ঘটনা, একদল সিনিয়র র‍্যাঙ্কের ছাত্র জুনিয়র র‍্যাঙ্কের ছাত্রদের বীরিক্ত করছে, এই ব্যাপারটা যখন কোর্টে তারা প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করলে, আমি তাদের বন্দুকের ছাড়পত্র বাতিল

করে তাদের ইনস্টিটিউট থেকে বার করে দিলাম। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার নাম ওয়ান্ডার্স-অফ-জাস্টিসের তিন নম্বরে চলে গেলো। এরপর কেটে গেলো দুটো গোটা বছর, আমি এবার অবসর প্রাপ্ত জাজ, এবার আমি পুনরায় আমার কাজ অর্থাৎ রিসার্চের কাজে মনো যোগ দিলাম, এবার রিসার্চের বিষয় বৃক্ষের দ্রুত বৃদ্ধির ঔষধ প্রস্তুত তাও আবার প্রাকৃতিক উপায়ে। এপরিকল্পনা যখন করছি তখন পাশের ঘরের মেজর জে.এইচ.রাও বললে, "কি, প্রফেসর এক্স এবার কি পরিকল্পনা করছেন?" আমি আমার পরিকল্পনা জানাতেই তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন হোক-হোক, তাহলে আমাদের পরিবেশের খানিকটা উন্নতি হবে। প্রায় দুমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন ওষুধটা প্রস্তুত করলাম, ততদিনে মেজর রাও মারা গেছেন। এরপর যখন ওষুধটির ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ওষুধটা যেন আরও পারলা লাগছে। সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ও তদন্ত করে জানলাম, ওষুধটি বদলে ফেলা হয়েছে এবং আমার সমস্ত রিসার্চ ওয়ার্ক চুরি হয়ে গেছে।

অবশেষে বিষন্ন মনে ঘরে ফিরে বসে আছি, এমন সময় মনে পড়ল, রিসার্চ ওয়ার্কের সব নথি আমি কপি করে রেখেছিলাম। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার অনুসন্ধান অভিযানের পর নিজের মূল্যবান সম্পত্তি হাতে পেতে আশ্বস্ত হলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন কী মনে হলো, আমাদের গুলি নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব জাগলো মনে, যে, গুলি গুলো মনে হয় ঠিক ভাবে কাজ করছে না, তাই তা নিয়ে রিসার্চের নামলাম আমি, প্রফেসর রয় এবং প্রফেসর সেন। রিসার্চের তিন বছরের মাথায় আমাদের এই রিসার্চের হেড প্রফেসর, রাজেশ রয় বা আর. জে.রয় রহস্য জনক ভাবে মারা যান।

এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে এই রিসার্চটির ঘোষণা করে গুলি তৈরির পদ্ধতি পরিবর্তন করা হলো এবং বন্দুক তৈরির পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হলো।

এর প্রায় সাথে চার মাস পর বাঁধল মারাত্মক গৃহযুদ্ধ, এই অযাচিত গৃহযুদ্ধ রুখতে সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হলো, এবং এক এক করে প্রায় সবাই শহীদ হতে লাগলো, অতএব এবার পালানোর পালা, কিন্তু সেগুতে বালি, পর্যায়ক্রমে আমাকে যেতে হলো যুদ্ধে, ধীরে ধীরে বাঙ্কারের সব সৈনিক একে একে মারা যাচ্ছে, অবশেষে বেঁচে আছি আমি আর সুনীল, হঠাৎ একটা গুলি এসে আমার চামড়া ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে গেলো।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেলো, বিছানার উপর উঠে বসে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলাম, তারপর আচম্বিতেই মনে পড়ল আমি আমার ঘরে অক্ষত অবস্থায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।

শেষ

৩১/১২/২০২৫ # গন্তব্য

“গন্তব্য” কথাটির অর্থ শেষ সীমা/ পর্যায়/ অবস্থা। যেমন আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তার গন্তব্য হলো শৌচালয়। তেমনি এ বৃহৎ সীমাহীন গোলকের মধ্যে আবদ্ধ সব কিছুরই গন্তব্য আছে। যেমন- ক) মানব জীবন খ) ছাত্র জীবন গ) কর্মজীবন প্রভৃতি। এ অজ্ঞাত সীমা যুক্ত সময় কালের মধ্যে মানব তথা প্রতিটি প্রাণীই চায় নিজের কর্ম সম্পন্ন করে যেতে, কিন্তু একশত জনের মধ্যে এর হার শূন্য শূন্য দশমিক এক শতাংশ।

সব প্রাণীই, বিশেষ করে মানুষ তার জ্ঞান হওয়া থেকেই অর্থাৎ সে যখন তার মস্তিষ্কের উপর চৈতন্য লাভ করে বা এ বৃহৎ পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র স্থানে থেকে সে সমস্ত পৃথিবীর কথা জানতে পারে কিংবা শুনতে পায় তখন থেকেই সে তার জীবনের লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থির করে নেয়।

এই লক্ষের উদ্দেশ্য পথ মায়া-ময়, তাই সে যখন তার লক্ষের উপর মনোনিবেশ করে সে নানা রকম স্বপ্নের দ্রষ্টা হয়ে উপস্থিত হয়।

মানব জীবন:-

এ-বৈচিত্রময় পৃথিবীতে মানুষ তার আগমনের সময় থেকেই ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনের তথা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন কর্মের জটাজাল বিস্তার করেছে, যার অন্ত একমাত্র তার অবসর কিংবা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

মানুষ হলে এই বৃহৎ পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যারা নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সৎ কাজ/ মহৎকাজ কিংবা অসৎকাজ করে থাকে, কারণ তাদের বুদ্ধি এতটাই বেশি যে তারা অদূর ভবিষ্যতে অমর হবার পরিকল্পনা করছে।

মানুষ হলো এ বিশ্বের সকল প্রাণীর চেয়ে বুদ্ধিমান এবং একটি শিক্ষিত মূর্খ জাতি যারা শিক্ষার গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু কাজে লাগায় না বা লাগাতে পারে না। যেমন পরিবেশের যত্ন এবং পরিবেশ রক্ষা।

মানুষ তার অনিশ্চিত সীমাবদ্ধ যাত্রা শুরু করে তার জন্মের ঠিক সেই সময় থেকে যখন সে তার স্বল্প চৈতন্য মাধ্যমে এ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীকে অনুভব করতে পারে, এবং তার বিচিত্র ও রোমাঞ্চময় এই যাত্রার শেষ গন্তব্য মৃত্যু।

ছাত্র জীবন:-

মানুষ তার স্বল্প জ্ঞানরত অবস্থায় তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও দুর্গম তপস্যায়রত হয়। এর এক মাত্র কারণ জানার আকাঙ্ক্ষা, বিশাল বিশ্বের এককোণে থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে জানার ইচ্ছা।

ছাত্ররা তার জ্ঞানরত অবস্থা থেকে নিজের জীবনের প্রায় চব্বিটা বছর ব্যায় করে নিজের শেষ গন্তব্য অবধি পৌঁছনোর জন্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদে সে তার জীবনের প্রচুর ত্যাগ সাধন করে, কিন্তু তার বিনিময়ে সে পায় একটি মিষ্ট ফল স্বরূপ নিজের স্বপ্নকে হাতের মুঠোর মধ্যে।

আজ থেকে প্রায় এক হাজার সাতশো সাতাত্তর বছর আগে অত্যাচারী ব্রিটিশরা আমাদের ভারত-মাতাকে স্বাধীন করেছে, তাদের প্রায় দুশো বছরের নাটকীয় ও অমায়িক তথা অকথ্য অত্যাচার থেকে। কিন্তু তাদের আগে, অর্থাৎ সে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত এদেশের পরিস্থিতি ছিল কিঞ্চিৎ আলাদা। ছাত্ররা অপেক্ষা করত কখন পাঠশালা ছুটি হবে এবং তারা খেলতে যাবে। কিন্তু বর্তমানের ছাত্রদের মধ্যে সেই মানসিকতা আর লক্ষ্য করা যায় না।

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা এতটাই কঠিন এবং জটিল যে, টা শিশুদের থেকে তাকে কৈশর, যৌবন সবই কেড়ে নিয়েছে।

<u>কর্মজীবন:-</u>

কর্মই মানব জীবনের ধর্ম,

কর্ম ছাড়া জীবন

বৃথা, জীবন ছাড়া মানব জন্ম।

এ-ধরিত্রীতে জন্মেছি যখন

করতেই হবে কাজ

তবে যেই সেই কাজে বলে

লোকে বলে সে-তো মরলোই আজ

মৃত্যু যেন মনে না রাখে জগৎ সংসার

সারা জীবন হয়ে যেন থাকি প্রিয় সবার।

সুতরাং আমরা এর থেকেই বুঝতে পারছি যে আমরা যত দিন বাঁচবো তত দিনই আমাদের কাজ করে যেতেই হবে।

Artistic Ballets

THIS BOOK IS PUBLISHED FROM ARTISTIC BALLETS AUTHOR’S COUNCIL

ARTISTIC BALLETS AUTHOR'S COUNCIL